অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের দ্বৈত নীতি এবং আইরিন খানের বাংলাদেশ সফর

শামসুজ্জামান সিদ্দিকী শাহীন*

সমাজের পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে কোন মানুষ বেড়ে উঠতে পারেনা। প্রত্যেকেরই ভালো খারাপ মিলিয়েই একটা অতীত থাকে। কেউ এক একটা পরিচয় যেমন, রাজনৈতিক, একাডেমিক, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পেশায় অসামান্য অবদান রেখে পরিচিত হন। নিষিদ্ধ না থাকা যেকোন রাজনৈতিক দলের সদস্য যে কেউই হতে পারেন, প্রচারও করতে পারেন তার নিজস্ব মতাদর্শ-এটা তার নাগরিক অধিকার। এসব কোনটাই দোষের নয়, কিন্তু সমস্যা হল যখন কিনা কেউ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে বসে তার বেড়ে উঠা অতীতের গন্ডি ও বিশ্বাসের বাইরে আসতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানটিকে সবার জন্য বলা হলেও সুচতুরতার সাথে যদি আমি আমার নিজের পলিটিক্যাল ছবক মানুষকে সুযোগমত ঝেড়ে দেই, সেক্ষেত্রে আমি তো আমার পদের সম্মান রাখতে পারলাম না। তবে হ্যাঁ, মিডিয়া হাতে থাকলে অনেক কিছু সম্ভব! ঘোড়াকে আকাশে উড়ানো যায় আবার ঈগলকেও পাতালে পাঠানো যায়।

আমাদের মত গরীবদেশের সমস্যা হল বাইরের বড়লোক ও বড়মাথাওয়ালাদের ছবককে আমরা বড্ড পাত্তা দেই, অন্য কথায়, তাদেরকে বেশ সুযোগও করে দেই আমাদের নাড়ি নক্ষত্রের মধ্যে সুবিধামত সময়ে ঢুকে পড়ে তা কেটে ছেটে ফেলার অথবা নিজেরাও সরল সমীকরন না মেনে অপরিপক্কতার পরিচয় দেই প্রায়শ।

স্বভাবতই ভাল অবস্থানে বাংলাদেশীরা এলে বেশ পুলকিত হই, যেমনটি হয়েছিলাম সিলেটের ছেলে ঢাকায় বৃটিশ লর্ড হয়ে আসায়। কিন্তু কেন যেন এসব আনন্দ আমাদের বেশীদিন স্থায়ী হয় না অথবা আমাদের কপালে এসব বোধ হয় সহ্যও হয়না! আমরা তাদেরকে আপন মনে করলেও তারা কিন্তু বেশ নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত 'ডিভাইড এন্ড রুলস্' এর দায়িত্ব পালন করতে এক বিন্দুও কমতি করেন না। আমাদের ভাইসরয়কে এখন গোল টেবিলের বাইরে আর ক'জন পছন্দ করে তা খুজতে হবে। তাদের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষনতা নিয়ে আমরা জাতি হিসেবে গর্ব করতেই পারি, কিন্তু তারা তো এখন উক্ত নিরপেক্ষ নামধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একনিষ্ঠ সেবক-সেবিকা। সুতরাং আমাদের আলোচনা সমালোচনা কোন ব্যক্তিকে কটাক্ষ করে নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগুলোর সাম্রাজ্যবাদী, দ্বৈত নীতির বিরুদ্ধে, অধিকাংশ মানুষদের মনের ভাষা না বোঝার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র প্রতিবাদ।

অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্ম ও মুসলিমফোবিয়া

ইংলিশ আইনজীবি পিটার বেনেনসন (Peter Benenson) ১৯৬১ সালের জুলাইতে লন্ডনে মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্ম দেন। বর্তমানের কাজের সাথে আকাশ পাতালের ফারাক থাকলেও প্রতিষ্ঠালগ্নে এটির উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি এরূপ, 'আমরা হলাম পৃথিবীর চারদিককার সাধারন মানুষ যারা মানবতা ও মানুষের অধিকার রক্ষায় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। যেকোন ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচার, সুষম আচরন, বাক-স্বাধীনতা ও সত্য যেখানে প্রত্যাখাত আমরা সেখানে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে তৎপর। ' এর বর্তমান লোগোটি হল, প্রতীকি মোমবাতির আলোয় বা শান্তির দ্যুতি ছড়াতে একটি কাটাতার বা অন্যায়-অবিচার বাধা দিচ্ছে। পিটারকে প্রতিষ্ঠানটি গড়তে ১৯৬০ সালের ১৯শে নভেম্বরে তার ঐতিহাসিক লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ভ্রমণই ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। পর্তুগীজ দুই ছাত্রের মাতাল হওয়াকে কেন্দ্র করে সাত বছরের সাজা দিয়েছিলেন তৎকালীন আদালত। সেই ঘটনাটিই তিনি পত্রিকাতে পড়ছিলেন ভ্রমণরত অবস্থায় এবং ভাবছিলেন সহায়-সম্বলহীন মানুষদের জন্য কিছু একটা করবার। সমাজের নিগৃহীত, উপেক্ষিত মানুষদের নিয়ে বিখ্যাত আর্টিকেল লিখলেন 'দি ফরগোটেন প্রিজনার্স (The Forgotten Prisoners)' এবং এর এক বছরের কম সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল বা সংক্ষেপে এ.আই। শুরুটাই ছিল বিতর্কের। উপরোক্ত ভ্রমণটি নিজের পকেটের টাকায় করেছিলেন বলে পিটার যে দাবীটা করেছিলেন তা নিয়ে তার কাছের লোকেরাই প্রশ্ন তুলেছেন। আর বর্তমানে তাদের নানা দ্বৈত নীতির প্রতিবাদে দুনিয়াব্যাপী বিতর্ক ও নিন্দা শাখা-প্রশাখা গজিয়ে মারাত্মক আকার ধারন করে এ.আইয়ের ললাটে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ২৭ বছরের মাথায় কালিমা একে দিয়েছে অথবা দিচ্ছে প্রতিদিন।

অন্যায়-অবিচারের মডেল তথা দুনিয়ার দোযখ গুয়ান্তানেমো বে’তে মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত ঢাকা দু’হাত পেছনদিকে পিঠমোড়া করে বাধা হতভাগা এক বন্দীর ছোট্ট এক খন্ড পাথরের উপর রাতদিন উঠবস করার বিরুদ্ধে এ.আইয়ের আনসাবসক্রাইব (Unsubscribe) আন্দোলন দুনিয়াব্যাপী বেশ বাহ্‌বা পেয়েছে। এই দোযখকে সাবেক সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট গুপ্তচর কর্তৃক অন্যায়ভাবে ধরে এনে শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের ক্যাম্প গুলাগ (Gulag)-র সাথে তুলনা করেছেন সংস্থাটির বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল আইরিন খান। তার এই সাহসী উচচারনে বুশ, চেনী, রামসফেল্ড সবাই ক্ষেপেছেন। যথাক্রমে তারা বলেছেন ‘উদ্ভট (absurd)’, ‘পীড়াদায়ক (offended)’, ‘নিন্দাযোগ্য (reprehensible)’। বলে রাখা ভাল, পাশ্চাত্যে কর্তৃক অবিচারের কদাচিৎ প্রতিবাদ করলে এমনেষ্টিকে বলা হয় ‘এন্টি ওয়েষ্টার্ণ’ আর পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে এটিকে ‘প্রো ওয়েষ্টার্ণ’ বলে। এই প্রতিষ্ঠানটির আচরনগত পার্থক্য খোলামেলাভাবে চোখে পড়ে যখন কোন এক পক্ষের নামের সাথে ‘মুসলিম’ শব্দটি সংযুক্ত থাকে। ইরাক ও আফগানিস্তান দখল, কাশ্মিরী ও ফিলিস্তিনীদের ষাট বছরের স্বাধিকার আন্দোলন, চেচেন, বলকানদের মুক্তি আন্দোলন, সুদানের ডারফুর সমস্যা, মরোদের আন্দোলন ইত্যাদিতে এ.আইয়ের জনপ্রিয় শ্লোগান ‘হিউম্যান রাইট নাউ (Human Right Now)’ কেন যেন থেমে যায়।

এই দু’মুখো নীতির বিরুদ্ধে সম্ভবত সবচে’ শক্তিশালী আর্টিকেল লেখেন এবং কথা বলেন লন্ডনের ইকোনোমিষ্ট, আগ্রাসীবিরোধী, অ্যামনেষ্টির একসময়ের কট্টর সমর্থক, লেখক পল দ্যা রোইজ (Paul De Rooij)। অনলাইন ম্যাগাজিন কাউন্টার পানচ (আলেক্সান্ডার ককবার্ন ও জেফ্রি সেন্ট ক্লেয়ার সম্পাদিত)-এ একাধিক আর্টিকেল লিখে এ.আইয়ের রিপোর্টে ব্যবহৃত চতুর শব্দাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ধনিক শ্রেণী ও মজলুম মুসলিম জাতির প্রতি আচরনের তুলনামূলক চিত্র পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, ২০০২ সালের ২ অক্টোবরে ইসরাইলী ট্যাংক ফিলিস্তিনের খান ইউনুস থেকে হঠাৎ প্রত্যাহারের পর পরই রাস্তায় প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে বোমাবর্ষণ করে ইসরাইলী হেলিকপ্টার। এমনকি আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে সাথে একটি মিসাইল হাসপাতালেও ছুড়ে দেয় । মুহুর্তেই প্রাণ যায় ১৪ জনের, আহত হন আরো ৮০ জন ফিলিস্তিনী। ‘মহা সাফল্য (গ্রেট সাকসেস)’ বলে আখ্যায়িত করলেন শ্যারন। কেউ হয়তো সংগত কারনেই আশা করছিল এ. আই কিছু বলবে। কিন্তু এর সমস্যা হল এরকম সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বেমালুম চেপে যাওয়া- ভূখন্ডের উপর ঘটে যাওয়া নিদারুন বড় বড় ঘটনাসমূহ না বুঝার ভান করা।

তিনি তার বিখ্যাত দুটি প্রবন্ধ (Amnesty International & Israel: Say it isn’t so এবং Amnesty International: A False Beacon?)-এ আরো লিখেছেন, এ.আইয়ের রিপোর্টিং-র ভাষা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। দ্বিতীয় ইন্তেফাদার শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি খুব কমবারই ইসরাইলী সহিংসতার বেলায় ‘নিন্দা (Condemn)’ শব্দটি পর্যন্ত উচচারণ করেছে। অথচ ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে রিপোর্ট করতে যেয়ে এ শব্দটির অপব্যবহারে এ.আই এক বিন্দুও কার্পন্য করেনি বা করছেও না। ভীতপ্রদ (horrific), বীভিৎস (shocking), ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা (deliberately killed) ইত্যাদি পরিভাষাসমূহ হতভাগা ফিলিস্থিনীদের জন্য স্থায়ীভাবে বরাদ্ধ করে রেখেছে এই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানটি। এমনকি শুধুমাত্র তাদের দিকে তাক করে এক রিপোর্টে একটি মাত্র প্যারায় তিনবার ‘যুদ্ধ অপরাধ’ শব্দ ব্যবহারের নজিরও স্থাপন করেছে এ.আই। পল প্রশ্ন করে লিখেছেন, যারা শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নীরিহ মানুষদের হত্যা, ধর্ষণ, অপহরন এমন কোন কুকর্ম নাই যা করেনা, সেই ইসরাইলীদের প্রতি আমাদের মানবাধিকার সংগঠনের আচরন এমন কেন? দখলদারদের নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে এ.আই মিনতির সাথে আহ্‌বান জানায় এরুপ, ইসরাইল নিয়ম কানুন মানছে না, তাদেরকে ভাল আচরন করতে হবে, মানবাধিকারের প্রতি তাদের সম্মান দেখানো উচিৎ (to breach legal provisions, to breach standards, to be disproportionate or elicit calls to respect human rights) ইত্যাদি। এসব দেখে মনে হয় এই. আইয়ের মোমবাতির শান্তির আলো ছড়াতে শুধু মুসলমানেরাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের প্রতি এ. আইয়ের অবিচার

নর্দান আয়ারল্যান্ডের এক স্কুলে পড়াশুনা করতে ষোড়শীতেই দেশ ছেড়েছিলেন সিলেটি মেয়ে আইরিন জোবায়দা খান। তারপর ইংল্যান্ড, আমেরিকায় পড়াশুনা শেষ করে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিষ্টসে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯৭৮ সালে। অনেক ক্ষেত্রে অসামান্য মেধার পরিচয় দিয়ে তিনি প্রথম হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, প্রথম মহিলা, প্রথম এশিয়ান, প্রথম মুসলিম ইত্যাদি। তাই তার এবারের সফর নিয়ে প্রজাতন্তের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সাধারন মানুষেরা পর্যন্ত বেশ আগ্রহ ও আনন্দ দুটোই দেখিয়েছে। যদিও তিনি এসেছিলেন সরকারী কোন উদ্যোগে নয় বরং প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ডঃ আতিউর রহমান (যিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে বিভিন্ন বিভাগে উচচপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন)-র প্রতিষ্ঠিতএনজিও (মানুষের জন্য)-র আমন্ত্রনে। যাহোক, সেদিকে না যেয়ে এবার দেখি ক্ষণে ক্ষণেবাংলাদেশের প্রতি এই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানটির আচরনই বা কেমন।

বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য একটি রক্তস্নাত লড়াই ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবাধিকারের ঝান্ডাবহনকারী অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের বয়স ছিল দশ বছরেরও বেশী। পাক বাহিনীর বর্বরতায় প্রকাশ্য সমর্থনদানকারী আমেরিকা ও বৃটেনের পদলেহী হয়ে একটি বিবৃতি দিতেও তাদের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। দালাল আইনের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কি এ.আই মুজিব সরকারকে চাপ দেয়নি? পুরোনো দিনের কথা না হয় বাদ দিলাম যদিও মিসেস খান সেটি নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন বলে মনে হয়। ২০০৬ সালের সংঘটিত ঘটনাসমূহ নিয়ে রিপোর্টিং করতেও এ.আই বাংলাদেশের প্রতি মারাত্মক অবিচারই করেছে বলতে হবে। রিপোর্টে ৩১ অক্টোবর রাজশাহীতে গণফোরামের সমাবেশে চারদলকে দায়ী করে হামলা, ১৫ নভেম্বর আওয়ামী লীগের কার্যালয়র সামনে ছোট ছোট সিরিজ বোমা বর্ষনে ৮ জন আহত, এমপি আসাদুজ্জামান নূর ও সাবের হোসেন চৌধুরীর উপর হামলার কথা উল্লেখ করে দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় না আনার কথা বলা হয়েছে। অথচ এই অল্প সময় (মাত্র ১৬ দিন)- র মধ্যে, আরেকটি মানবাধিকার সংস্থা ‘অধিকার’-র রিপোর্ট অনুযায়ী ৫০ জন (যাদের মধ্যে ৩৯ জনই ৪ দলীয় জোটের)-র মৃত্যু ও ২৫০ জনের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং সর্বোপরি মানবেতিহাসে সবচেয়ে অসভ্য, হিংস্র ঘটনা ২৮ অক্টোবর (যা বিবিসি ও সিএনএন সহ সব আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম লাইভ সম্প্রচার করেছ) সৃষ্টি করা হয়, এ। আইয়েরএকই বছরের রিপোর্টে আশ্চর্যজনকভাবে এসবের উপস্থিতি দারুনভাবে উপেক্ষীত হয়েছে।

১৩ জানুয়ারী দৈনিক নয়াদিগন্তে আলফাজ আনাম ‘অধিকার’-র গত বছরের রিপোর্ট নিয়ে লিখেছেন, ‘..... ২০০৭ সালের ১২ মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ১৮৪ জন নিহত হয়েছে। জেলহাজতে মারা গেছে ৮৭ জন। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৫৯ জন, এর মধ্যে ২৪৬ জনই শিশু। অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৬১টি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ১২০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। অপহরণ করেছে ৯৮ জনকে, ৩ জন বাংলাদেশী নারী বিএসএফ’র হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ১৯৮ জন বাংলাভাষী নাগরিককে পুশইন করা হয়েছে। .... আমরা আরো লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করলেও এ ব্যাপারে অ্যামনেস্টি বা সুশীল সমাজের দাবিদাররা নিশ্চুপ। অধিকার-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালে ১২০ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ’র হাতে নিহত হয়েছে অর্থাৎ মাসে ১০ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতি বছর এ হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বেড়েই চলছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩৯১ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে গড়ে ৭৮ জনকে হত্যা করা হলেও ২০০৭ সালে তা ১২০ জনে দাঁড়িয়েছে। ’ উল্লেখ্য, চায়নার সাথে সীমান্তরেখা থাকলেও বিএসএফ-র গুলি ওদিকে কিন্তু ফোটে না, শুধু হতভাগা বাংলাদেশীদের ধরে ধরে গুলি করতেই তারা ব্যস্ত!

অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এসব নিয়ে কথা বলেনা, ২৮ অক্টোবর টাইপের দিনগুলো নিয়ে দেশী মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামালরা পর্যন্ত কথা বলেন না (যদিও সেনাপ্রধান সুযোগ পেলেই এর বীভিৎসতা নিয়ে খুব বলেন, কিন্তু খুনীদের ধরার ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে একদম চুপ!))। কারন, এর মাঝে কেমন যেন অন্য রকম ফোবিয়া আছে, মৌলবাদীর গন্ধ রয়েছে। আইরিন খান কথা বললেন পুলিশ হেফাজতে আদিবাসী একজন চলেশ রিছিলের মৃত্যু ও কার্টুনিষ্ট আরিফের মুক্তি নিয়ে। জরুরী অবস্থা নিয়ে কথা বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, কারন এটি নিয়ে কথা বললে নাকি দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলানো হবে। তিনি নাক গলিয়েছেন, না কান ধরে টেনে আমাদেরকে পরনির্ভরদের সারিতে ফেলতে চাইছেন

তার নিরূপণের দায়িত্ব পাঠকদের উপরই রইল। ২৮ জানুয়ারী তার কাছের একটি পত্রিকায় ‘বাংলাদেশে অধঃপতনের চক্র’ নিবন্ধ লিখে আবারো উক্ত গারো নেতার মৃত্যু ও স্থানীয় র‌্যাব-কর্মকর্তাদের দ্বারা একজন সাংবাদিককে নির্যাতনের কথা লিখেছেন। জরুরী অবস্থাকালীন বছর নিয়ে লিখেছেন, ‘অবশ্যই শারিরীক নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার লংঘনের পরিস্থিতি আগের তুলনায় নাটকীয়ভাবে উন্নত হয়েছে’ (উল্লেখ্য পুলিশই কিনা বলেছে আগের বছরের তুলনায় গত বছরে অপরাধ ২০ শতাংশ বেড়েছে)।’ যাহোক, এসব ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন যেন মিসেস খান নিজেকে ব্রাকেট বন্দী করে ফেলছেন, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পদের সম্মান রাখতে নিজের আগের একচোখা নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারছেন না, অন্য কথায় মৌলবাদীর ভূত বা বিষাক্‌ত কালনাগিনীর থাবা হয়তোবা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ।

তিনি হয়তো পালটা প্রশ্ন ছুড়ে বলবেন, এত অল্প সময়ে একসাথে অত মানুষের লাশ নিয়ে কথা বলা যায়? তাছাড়া আশপাশের মানুষজনের জন্যও বা বলি কিভাবে? আমরা তাকে অনুরোধ করব, ঠিক আছে সময় করে পরে বলবেন, মাথা ঠান্ডা রেখে পরে লিখবেন। সাথে এও অনুরোধ করবো, দূর থেকে না বলে ঢাকায় এসে যেভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঝেড়ে দিয়ে গেলেন (জরুরী অবস্থাই শুধু বাকী রেখেছেন), ঠিক সেভাবে না হলেও অন্তত মাঝারি সারির দু’একজন সাংবাদিক ডেকে ওয়াশিংটন বা লন্ডনে গিয়ে অথবা তাদের প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার বা আর্মি চীফদের সাথে সাক্ষাৎ করে মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লংঘনকারীদেরকে দু’ কথা শুনিয়ে আসেন। আমরা আপনাকে নিয়ে আরো গর্ব করব।

একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনের ভাষা না বুঝে অতিশয় ক্ষুদ্র কিছু বিকৃত চিন্তার মানুষদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মোড়লদের একান্ত হয়ে দূর্বল বিড়ালদের সুযোগে ইদুরের মত পেছন থেকে গৃহস্থের গোলার সব ধান খাওয়ার পরিনাম কখনো শুভ হবে না। দুই কুকুরের লড়াই বলে যারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অপমান করেছে, শুধু তাদের মানবাধিকার রক্ষা করাই কি মিসেস খানের এবারের মিশন? এভাবে চলতে থাকলে মোমবাতির নিভু প্রদীপে কখনো শান্তির দ্যুতি বিশ্বে ছড়াবে না এবং নিরপেক্ষতার কপট প্রমান রাখা কস্মিনকালে সম্ভবও হবে না। নব্য গনতন্ত্রীদের অধঃপতনের চক্রের নামে অকার্যকর অঞ্চল ও মৌলবাদ তত্ত্বের উদ্ভট ফর্মুলা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অশান্তির বিশবাস্পের ছোবল একসময় তাদেরকেও যে গ্রাস করবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায়?

* কানাডা থেকে। ইমেইলঃ shahin72@gmail.com